একটী সুন্দরী তরুণী বসিয়াছিলেন. এই দৃশ্য সহিতে না পারিয়া তিনি রুমালে চক্ষু ঢাকিলেন।

সাক্ষী সাবুদ সমস্তই উপস্থিত ছিল। অপরাধী বিচারকের সম্মুখে তাহার স্বপক্ষে একটিও কথা বলিল না, আত্মদোষ ক্ষালনের কোনও চেষ্টাই সে করিল না। অবিচলিত আশ্চর্য্য ধৈর্য্যের সহিত স্থির হইয়া অবনত মস্তকে দণ্ড গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল।

বিচারক যখন সকলের সম্মুখে মুক্তকণ্ঠে আসামীর দণ্ডাজ্ঞা প্রচার করিলেন- জাল নোট চালান করা অপরাধে অপরাধীর সাত বৎসরের কারাবাস তখন সে ঈষৎ—ঈষৎ মাত্র শিহরিয়া উঠিল। সাত বৎসর—দীর্ঘ—অতিদীর্ঘ সাত বৎসর কাল—উঃ! কি ভয়ানক! দর্শকবৃন্দ স্তম্ভিত রুদ্ধশ্বাস। সেই তরুণীটী একটা অস্ফুট আর্ত্তধ্বনি করিয়া তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

সকলের দৃষ্টি তখন আসামীকে ছাড়িয়া যুগপৎ সেই মূর্চ্ছাতুরার দিকে আকৃষ্ট হইল। কেহ বলিল "মেয়েটির ফিটের ব্যামো আছে বুঝি?" কেহ বা ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া—"এ সব ব্যাপারে আবার মেয়েছেলেকে আনা কেন বাপু? একি থিয়েটার না বায়োস্কোপ দেখা?" বলিয়া মনের বিরক্তি প্রকাশ করিল। আর যাহারা অরুণ ও বেলার প্রণয়-ঘটিত ব্যাপার অবগত ছিল, তাহারা "আহা! মেয়েটি কি দুরদৃষ্ট!" বলিয়া সক্ষোভে সহানুভূতির দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল।

দণ্ডিত আসামী অরুণ এতক্ষণ কোনও দিকেই চাহিয়া দেখে নাই। কিন্তু কাঠগড়া হইতে বাহির হইয়া বিপুল বেদনা, অবমাননা ও দুঃখের গুরুভার বহিয়া সে যখন বন্দীরূপে প্রহরী সঙ্গে যন্ত্রচালিতের মত চলিয়া যাইতেছিল, সেই সময় সহসা তাহার দৃষ্টিপথে পড়িল, সংজ্ঞাহারা বেলার সেই ঊষার আকাশের বিলীয়মান তারার মত দীপ্তিহীন পরিম্লান পাণ্ডুর

মুখখানি—অমনি তাহার ব্যথাভরা বুকের উপর কে যেন সজোরে কষাঘাত করিল।

এতক্ষণ পরে অরুণের অপমান-দগ্ধ তীব্র জ্বালাময় অশ্রুহীন আরক্ত চক্ষুদুটীতে তপ্ত অশ্রুর উচ্ছ্বাস হু হু নামিয়া পড়িল। সে অশ্রু অশ্রু নহে, হতভাগ্য বন্দীর অনুতপ্ত দীর্ণ বক্ষের উষ্ণ শোণিত-নিস্রাব।

একুশ

"এখনো উঠলি না বেলা? আচ্ছা, এমন করে আর ক'দিন বাঁচবি বল্‌তো? যা হ'বার তাতো হয়ে গেছে, এখন তারি জন্যে না খেয়ে না ঘুমিয়ে দিনরাত কেঁদে কেঁদে প্রাণটা দিয়ে কি লাভ হবে বোন্? তুইতো অবুঝ নয়।"

ভূলুণ্ঠিতা, রুক্ষকেশা, দীনবেশা বেলা জয়ন্তীর ব্যথাভরা সস্নেহ অনুযোগে চক্ষের উদ্গত উচ্ছ্বসিত অশ্রুধারা মুছিতে মুছিতে রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "এ পাষাণ প্রাণ এত সহজে যাবার নয় বউদি! নইলে তাঁর সেই দশা স্বচক্ষে দেখে, সেই নিষ্ঠুর শাস্তির আজ্ঞা কাণে শুনেও এখনো বেশ বেঁচে রয়েছি!"

বেলার অবলুণ্ঠিত আলুলায়িত কেশরাশিতে হস্তার্পণ করিয়া জয়ন্তী সান্ত্বনাময় কোমল কণ্ঠে বলিল, "ভগবান্ যা করেন তা মঙ্গলের জন্যেই করেন ভাই! আগুনে না পুড়লে সোণা খাঁটী হয় না, জানিস তো? তুই তার জন্যে এত দিন কি না করেছিস? কিন্তু নিষ্ঠুর সে তোর মর্ম্ম তো বুঝলে না, তোর এত বড় ত্যাগ, এত বড় দানের মর্য্যাদা সে তো রাখতে পারিলে না! এখন তাকে তার কৃতকর্ম্মের ফল ভুগাতে দে, দেখ এতেই যদি তার চক্ষু খোলে।"

"কিন্তু এ হতভাগীর জন্যেই যে আজ তাঁর এই নিগ্রহ, এই বিপত্তি, এ কথা যে আমি কোনও দিন ভুলতে পারব না বউদি! এ কথা যে আমার মনে চিরদিন কাঁটার মতই বিঁধবে! আমার সঙ্গে দেখা না হলে তাঁর জীবন কত সুখের, কত গৌরবের হ'ত সেটা একবার মনে ভেবে দেখ দেখি।"

"এ মিছে কথা। তোর দোষ কি ভাই! তুইতো তার সুখের পথ থেকে সরেই এসেছিলি, সে নিজেই উপযাচক হয়ে এলো, এসে তোর জীবনটাও নষ্ট করলে আর আপনিও অধঃপাতে গেল।"

"তা হলে তাঁর এই অধঃপতনের জন্যে শুধু আমিই কি দায়ী নই বউদি? বলো বউদি! এই কথাটী মনে করে' আমার বুকে যে দিন-রাত রাবণের অনির্ব্বাণ চিতা জ্বলছে!"

"কক্ষণো না, ওতো খালি একটা ছুতো ভাই! সংসারে দীন দুঃখী ভিখারী যারা তারা ও তো স্ত্রী পরিবার নিয়ে ঘর সংসার করছে। অরুণ যখন তোর জন্যে বাপ মা, আত্মীয় স্বজন, আর অত বড় রাজার সম্পত্তির লোভ অনায়াসে ত্যাগ করতে পারলে, তখন তোকে বিয়ে করে' সে সাধারণ গৃহস্থের মত স্বচ্ছন্দে না হক, সুখে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করতে পারত নাকি? তা না করে' মিছে দুরাকাঙ্ক্ষার বশীভূত হয়ে সে নিজেও মজল, আর তোকেও মজালো। তাব এ ভালবাসাকে আমি তো সত্যিকার ভালবাসা বলি না বেলা!"

"ভালবাসা নয়? তবে এ কি বউদি?"

"মোহ, আসক্তি।"

"তাই কি?"

বেলার অশ্রু-সজল সুন্দর মুখখানিতে ব্যথার চিহ্ন স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিল। ব্যথিত আহত কণ্ঠে সে কহিল, "কিন্তু আমি তো তাঁকে সত্যিকার ভালবাসাই বেসেছি বউদি! বিয়ে না হ'লেও এতদিন মনে প্রাণে শুধু তাঁরই আরাধনা করেছি, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর যা কর্ত্তব্য সেটা তো আমাকে এখন করতেই হবে।"

"তুই যে তার চেয়ে ঢের-ঢের বেশী করেছিস বেলা! কজন স্ত্রী স্বামীর জন্যে এতখানি ত্যাগ স্বীকার করতে পারে? জীবনের সুখ শান্তি,

আশা আকাঙ্ক্ষা, সুনাম সম্মান সমস্তই তো তুই তারি জন্যে বিসর্জ্জন দিয়েছিস, সম্বলের মধ্যে ছিল গায়ের গহনা ক'খানা।"

নিরাভরণা বেলার পানে সকরুণ দৃষ্টিপাত করিয়া জয়ন্তী সদুঃখে বলিল, "তাও তো ঘুচিয়ে দিলি, তুই নিজের দিক থেকে করতে আর বাকি কি রেখেছিস বোন?"

বেলা সজল নয়নে ব্যথার চকিত ম্লান হাসি হাসিয়া উত্তর করিল, "গহনার জন্য তুমি দুঃখ করছ বউদি? কিন্তু এ প্রাণ দিলেও যদি তাঁকে বাচান যেত, তা'হলে আমি তা'ও যে তক্ষুণি দিতে পারতুম ভাই!"

"তা আমি জানি। কিন্তু সে যখন হবার নয়, তখন এমন করে' নিজের হাতে নিজের গলা টিপে, ভগবানের দেওয়া এত বড় প্রাণটাকে তুই নষ্ট করছিস কেন বলদেখি?"

"আমার বেঁচে থেকেই বা কি হবে বউদি?"

বেলার হতাশ ক্লান্ত স্বরে ব্যথিত হইয়া জয়ন্তী তাহাকে শান্ত করিবার অভিপ্রায়ে বলিল,—

"এখন হতাশ্বাস হলেতো চলবে না ভাই, মনে আশা রাখ, আশাতেই মানুষ বেঁচে থাকে। সাত বৎসরতো খুব অনেক দিন নয়।"

"বল কি বউদি? সাত বৎসর। উঃ! এতকাল, তাঁর আশা ধরে আমি কি বেঁচে থাকতে পারব বউদি?—একদিন, এক মুহূর্ত্ত যে কাটানো ভার হয়ে উঠেছে!"

"পারবি না? কিন্তু আমাকে দেখ দেখি বোন! যে আশা জীবনে, এ জন্মে পূর্ণ হবার সম্ভাবনা নেই, সেই জন্মান্তরের আশা ধরে' প্রাণ ধারণ করে' আছি! সাত বৎসর কি এতই দীর্ঘ বেলা? যার প্রতীক্ষায় বেঁচে থাকা যায় না?"

জয়ন্তীর সেই সখেদ করুণ উক্তি বেলার সন্তাপিত চিত্তে আর এক নূতন বেদনার সৃষ্টি করিল।

জয়ন্তীতো মিথ্যা বলে নাই। এই সাতটী বৎসর ধৈর্য্য ধরিয়া কোনও-মতে কাটাইয়া দিতে পারিলে বেলা তাহার বাঞ্ছিত দয়িতকে পুনর্ব্বার ফিরিয়া পাইতেও পারে, কিন্তু হতভাগিনী বিধবার প্রিয় সম্মিলনের আশা কোথায় কতদূরে? জন্মান্তর কি সত্যই আছে?

অন্তরভেদী দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বেলা ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিল, "যা বলেছ তা ঠিক বউদি! কিন্তু আমি সেই আশায় বেঁচে থাকলেও এত কষ্ট, এত অপমান সহ্য করে' তিনি কি এতদিন জীবন ধারণ করতে পারবেন? তাঁর অবস্থাটা তুমি একবার মনে করে' দেখ দেখি—যে একদিন রাজ-ঐশ্বর্য্য রাজ-সম্মানের অধিপতি ছিল, সে কিনা আজ জেলের কয়েদী —আঃ! সাধে কি আর এ পোড়া প্রাণ গলা টিপে বার করে' ফেলতে ইচ্ছে করে বউদি? আমার মতন দুর্ভাগিনী জগতে আর কে আছে ভাই! আমি যে সাগর ছেঁচা মাণিক পেয়েছিলুম কিন্তু রাখতে পারলুম না তো!"

বেলার চক্ষে পুনরায় অশ্রু উৎস বহিল, জয়ন্তী তাহার চক্ষের জল মুছাইতে মুছাইতে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টায় বলিল, "স্থির হ' ভাই! ধৈর্য্য ধর! ধৈর্য্য ভিন্ন এখন তো আর কোনই পথ নেই। এ রকম উতলা অবসন্ন হয়ে পড়লে আর যে কিছুই করা হবে না।"

হতাশ ভরে বেলা বলিল, "করবার আর কি আছে বউদি?—আমার সব কাজই তো শেষ হয়ে গেছে!"

"শেষ আর হল কই? তোর জীবনের সব চেয়ে বড় কর্ত্তব্য যে এখনো বাকি আছে বেলা!"

বেলা তাহার জলভরা চক্ষের কাতর দৃষ্টি জয়ন্তীর স্নেহস্নিগ্ধ মুখে

দিকে মেলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কথা আমি যে বুঝতে পারছি না বউদি! তুমি আমাকে এখন কি করতে বলো?"

"তার যে দুঃখ কষ্টের কথা এই মাত্র বলছিলি, তারই একটু লাঘব করে' এ দুর্দ্দিনে তাকে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা—"

বেলা পরম আগ্রহে বলিল, "কিন্তু সে কি করে' হবে ভাই!—আমি নিতে চাইলেও তাঁর এ দণ্ডর ভাগ আমাকে কেউ দেবে না তো!"

"তা জানি, তবে তুই মনে করলে স্নেহ প্রেম আশা আশ্বাস দিয়ে তার দুর্ব্বহ ঘৃণিত জীবন কি সার্থকতার মোহন স্বপ্নে ভরিয়ে রাখতে পারবি না? এইটুকু ক্ষমতা, এ শক্তি যে ভগবান্ সব মেয়েকেই দিয়েছেন বোন্!"

দুঃখিনী সর্ব্বহারা বেলা এতক্ষণে যেন অকূলে কূল দেখিতে পাইল। ধূলিশয্যা ত্যাগ করিয়া সে শশব্যস্তে উঠিয়া বসিল। তাহার পর ভক্তি শ্রদ্ধায় নত হইয়া জয়ন্তীর পদধূলি মাথায় লইয়া সে উচ্ছ্বসিত গদ্‌গদ কণ্ঠে কহিল, "পারব,—দিদি! পারব—তুমি শুধু আমাকে আশীর্ব্বাদ করো। আজ থেকে আমার জীবনে শুধু এই একই কামনা একই লক্ষ্য রইল, এই লক্ষ্য নিয়েই আমি এখন বেঁচে থাক্‌ব,—থাক্‌তে পারব।

বাইশ

আজ সে বন্দী !

অতি ভয়াবহ নিষ্করুণ কঠিন কারাগার, তাহার দুর্ভেদ্য লৌহময় বিকট বাহুবেষ্টনী দিয়া বন্দীকে দিনরাত বিভীষিকাময় বক্ষের মধ্যে সাপটিয়া চাপিয়া আছে। সে নির্ম্মম কঠোর পেষণে অহরহ নিষ্পেষিত হইয়া সেই বিশ্বসংসার হইতে নির্ব্বাসিত, স্বাধীনতা ধনে বঞ্চিত হতভাগার জীবনের সুখ সাধ, আশা আকাঙ্ক্ষা সমস্তই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, আছে শুধু স্মৃতি, আর অনুভূতি,—যাহার অসহনীয় তীব্র দহন তাহাকে ক্ষণে ক্ষণে পলে পলে মরণের অধিক যন্ত্রণা দিতেছে ! যাহার তীব্র বিষে বিষাক্ত হইয়া কারাগারের রুদ্ধবায়ু ক্রমেই আরো দুর্ব্বিসহ, প্রাণান্তকর হইয়া উঠিতেছে—যাহার আর বিরাম নাই বিশ্রাম নাই !

তাহার নিভৃত বন্দী জীবনে এখন এই তো একমাত্র সম্বল ! একমাত্র সঙ্গের সাথী !

ফাল্গুনের নির্ম্মল প্রভাত। তরুণ রবির সোণার কিরণ কারাগারের কৃষ্ণ কঠিন লৌহময় গরাদাগুলিতে প্রহত হইয়া এক ঝলক সেই বিষাদ ছায়াচ্ছন্ন অন্ধকার অবরোধ কক্ষের ভিতরে আসিয়া লুটাইয়া পড়িয়াছে। সেই আলোটুকুর দিকে লুব্ধ তৃষিত দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিল, বন্দী অরুণ, যাহার চক্ষে আজ বিশ্বের সমস্ত আলো নিঃশেষে নিভিয়া গিয়াছে !

প্রভাতের উদার মুক্ত নীলিম আকাশ হইতে ঝরিয়া পড়া সুখময় স্নিগ্ধ বাতাসটুকু, এক একবার সেই ভাগ্যবিড়ম্বিতের সন্তপ্ত দেহ মনে মৃদু কোমল স্পর্শ বুলাইয়া তাহাকে সান্ত্বনা দানের বৃথাই প্রয়াস পাইতেছিল।

বাহিরে রৌদ্র ভাসিত মুক্ত গগনতলে সশস্ত্র সতর্ক প্রহরী গম্ভীর মুখে সদর্পে বিচরণ করিতেছে। এক পার্শ্বে একটা নিশি জাগরণ-ক্লান্ত গৃহ-পালিত সারমেয় প্রভাতের সুখকরোষ্ণ ধরণী-বক্ষে আলস্য জড়িত দেহখানা এলাইয়া দিয়া আরামে নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতেছে।

কারাগারের সুউচ্চ সুদৃঢ় প্রাচীরের উপর বসিয়া একটী ছোট পাখী ঘন ঘন পুচ্ছ নাচাইয়া মনের আনন্দে শীষ দিতেছিল। সে যখন যেখানে ইচ্ছা ডানা মেলিয়া উড়িয়া যাইতে পারে, তাহাকে বাধা দিবার, বারণ করিবার কেহই নাই।

ঈর্ষাদিগ্ধ জ্বালাভরা দৃষ্টিতে তাহাদের দিকে চাহিয়া অরুণ ভাবিতেছিল, একদিন সে-ও ঐ আনন্দময় মুক্তির জগতের প্রাণী ছিল,—কিন্তু আজ? হায় রে দুর্ভাগা!

এই বীভৎস কারাগারের দুর্লঙ্ঘ্য কঠোর আবেষ্টনী কি জানি তাহাকে এখনো কত দিন, কত রাত্রি, কত দণ্ড, কত প্রহর, কতবর্ষ, কত মাস—এমনি নির্ম্মমভাবে বন্দিত্বের দুশ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিবে! এইতো মাত্র সাতটী দিন, সাতটী যুগের মতই কাটিয়াছে! এখনো এমনি কত দীর্ঘ দিন এ জীয়ন্তে নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে!

মুক্তি! মুক্তির আশা আজ কোথায়? সে আর কেমন করিয়া মুক্তিলাভ করিবে? হতভাগ্য বন্দীর প্রতি দয়া করিয়া কে তাহাকে মুক্ত করিতে আসিবে? কেউ না!

তবে আজ যদি সে ঐ নিশ্বাস নিরুদ্ধকারী কঠিন গরাদাগুলো নিজ বাহুবলে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া ঐ কর্ত্তব্যে অটল নিষ্ঠুর প্রহরীকে প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাতে ধরাশায়ী করিয়া এ যন্ত্রণাময় বন্দিত্ববন্ধন ঘুচাইতে পারিত—কিন্তু তাহাতেই বা কি লাভ? মুক্তিলাভ করিয়া সে এখন যাইবে কোথায়?

জেলের দাগী পলাতক আসামী, তাহার বিপুল কলঙ্কের বোঝা

বহিয়া কোথায় গিয়া লুকাইবে? লোকালয়ে কেমন করিয়া সে মুখ দেখাইবে? তাহার জঘন্য ঘৃণিত জীবন নির্ব্বাহের জন্য সে এখন কোন্ পন্থা অবলম্বন করিবে? এই বিশাল বিশ্বসংসারে সে যে এখন এক বিন্দু করুণা - একমুষ্টি ভিক্ষালাভের প্রত্যাশাও করিতে পারে না। জগতের কাছে সে এখন পাইবে শুধু ঘৃণা ও ছিছিক্কার।

তাহার উপর নিদারুণ বন্ধনভীতি পলায়িত বন্দীর অভিশপ্ত জীবনকে যে অহরহ কুম্ভীপাকে জড়াইয়া রাখিবে! অভাবের তাড়নায়, ক্ষুধার যাতনায় অধীর অন্ধ হইয়া তাহাকে হয় তো বাধ্য হইয়াই আবার এই পথেই আসিতে হইবে, আবার এই দুর্ব্বিসহ কারাযন্ত্রণা-ভোগ, এই ঘৃণিত বন্দী জীবন যাপন—আঃ! তবে,—তবে এখন মুক্তির উপায় কি?

উপায় একটী মাত্র আছে—আত্মহত্যা!

কিন্তু তাহাই বা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

প্রহরীর সতর্ক দৃষ্টি অবিরত তাহার দিকে নিবদ্ধ। পরিধানের বস্ত্র এত সঙ্কীর্ণ যে গলায় ফাঁস জড়াইয়াও মরিবারও উপায় নাই। একখানা ছুরীও কাছে নাই যে বুকে বিঁধিয়া মরিবে!

তবে এক কাজ করিলে হয় না? গভীর নিশুতি রাতে, প্রহরীদের তন্দ্রাজড়িত চক্ষে ফাঁকি দিয়া বলিষ্ঠ দেহের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়া, ঐ ভীষণ লৌহ গরাদার উপর সজোরে, সবলে মাথাটা ঠুকিয়া দিয়া যদি একই আঘাতে এ পাপ প্রাণের অবসান করিয়া চির মুক্তি-পথের যাত্রী হইতে পারে—আঃ! সেই ভাল, সেই ভাল! সেই চেষ্টাই এখন সে দেখিবে।

কিন্তু আত্মহত্যা যে মহাপাপ,—অপঘাতে মৃত্যু সে যে বড় ভয়াবহ ব্যাপার! তবে তাহাতেই বা ভয় কি? বাঁচিয়া থাকিয়া এমন করিয়া

তিলে তিলে পলে পলে মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করিতে সে যে আর পারে না। মরণ ভিন্ন এ যন্ত্রণার শান্তি নাই তো!

আর তাহার মত দুর্ভাগ্য দুরাচারীর মরণে পৃথিবীতে কাহার কি ক্ষতি হইবে?—কাহারও না। তাহার জন্য কাঁদিতে এ সংসারে আর কে আছে? কেউ না!

পিতা?—পুত্রকলঙ্ক হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়া তিনি এতদিনে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিবেন,—সে তো পুত্র নয়—কুলাঙ্গার!

তবে মায়া—আদরের ছোট বোনটীর কথা মনে করিয়া অরুণের শুষ্ক চক্ষে অশ্রুর সঞ্চার হইল।

কিন্তু মায়া বালিকা,—সে হয় তো এতদিনে তার হতভাগ্য দাদার কথা ভুলিয়াই গিয়াছে, যদি না ভুলিয়া থাকে,—তবে লুকাইয়া এক ফোঁটা চক্ষের জল মুছিবে—তাহার পর আবার সব ভুলিয়া যাইবে। তাহার কলঙ্কিত দুঃখময় স্মৃতি মনে করিয়া রাখিবার জন্য কাহার মাথাব্যথা পড়িয়াছে?

তখন মেঘাচ্ছন্ন আকাশের একটী,—একটী মাত্র উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় নক্ষত্রের মত অরুণের ঘন অন্ধকারময় অন্তরাকাশে চকিতে ফুটিয়া উঠিল, বিচারালয়ে মূর্চ্ছাতুরা বেলার সেই শ্বেতপদ্মের মত শুভ্র করুণ আর্ত্ত মুখখানি! হায় রে! সেই কল্যাণরূপিণী দেবীকল্পা প্রেমময়ী নারী, সে যে তাহারই জন্য কত ক্লেশ কত লাঞ্ছনা অবমাননা সহ্য করিয়াছে, তাহাকে সুপথে ফিরাইবার জন্য সে কত যত্ন কত চেষ্টাই না করিয়াছে, সে তাহাকে এখনো প্রাণ মন অন্তর দিয়া কত,—কত ভালবাসে! এত হতাদর, এত নির্য্যাতনেও তাহার ভালবাসা যে বিন্দুমাত্র হ্রাস হয় নাই!

এখন দুর্ভাগা বন্দীর এই শোচনীয় অপঘাত-মৃত্যুর সংবাদ সেই প্রেম-সর্ব্বস্বা নারীর কুসুম কোমল বুকে বাজের মতই বাজিবে নাকি?

এ আঘাত সহ্য করিয়া সে কি আর বাঁচিবে? না, না, এযে তাঁর ভুল, বিষম ভুল। আত্মহত্যা না করিয়া বন্দী যদি এই জঘন্য কারাবাসে সাতটী বৎসর জীবিত থাকে, তাহা হইলে দণ্ড অন্তে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া সে যখন তাহার কুৎসিত হতশ্রী ও দুরপনেয় কলঙ্কের ছাপ লইয়া বেলার সম্মুখে গিয়া প্রেমার্থী করুণার ভিখারী রূপে দাঁড়াইবে, তখন রূপসী তরুণী বেলা কি তাহার প্রণয়ীর ঘৃণিত কদাকার মূর্ত্তি দেখিয়া ঘৃণায় আতঙ্কে শিহরিয়া তাহার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইবে না? নাঃ!— বাঁচা আর হইবে না। যেমন করিয়া হউক, অরুণকে এখন মরিতেই হইবে। কাহার জন্য কিসের প্রয়োজনে সে এত কষ্ট, এত হীনতা স্বীকার করিয়া বাঁচিয়া থাকিবে? তাহার জীবনে তো সংসারে কাহারও কোনও প্রয়োজনই নাই।

চিন্তাবিষ্ট বন্দীর জটিল চিন্তাসূত্র ছিন্ন করিয়া দিয়া কারাকক্ষের রুদ্ধ দ্বার ঝন্ ঝন্ শব্দে খুলিয়া গেল। ওয়ার্ডার আসিয়া জানাইল, একজন ভদ্রমহিলা বন্দীর সাক্ষাৎ অভিলাষিণী।

অরুণ চমকিয়া উঠিল। কে এ ভদ্রমহিলা? আবার কে? বেলা, নিশ্চয়ই সেই! ওঃ! সে এখানেও আসিয়াছে! দীনহীন অবজ্ঞাত বন্দীর দর্শনকামনায় এই কারানরকেও সে আসিয়াছে! আ! ভগবান্! ভগবান্! মরুভূমে এ ওয়েসীস বুঝি তোমারই করুণার অযাচিত দান?

কারাগৃহের শ্রী ফিরিল। দেবীরূপিণী বেলা যখন তাহার সেই দেব-বাঞ্ছিত রূপ-সম্পদ ও ব্যথা-করুণ সজল স্নিগ্ধ আঁখি দুটী লইয়া বন্দী অরুণের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন মুগ্ধ অরুণ নিমেষের জন্য ভুলিয়া গেল যে সে এখন জেলের কয়েদী।

যে পবিত্র মহৎ প্রেমের অপরাজিত শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া অরুণ একদিন তাহার করতলগত সুখ সম্পদ, সম্মান প্রতিষ্ঠা সমস্তই তুচ্ছ

করিতে পারিয়াছিল, আজ বহুদিন পরে সেই সর্ব্বত্যাগী, সর্ব্বভোলা প্রেম, সেই হিতাহিত জ্ঞানশূন্য অন্ধ অনুরাগ তাহার বিপর্য্যস্ত বিক্ষুব্ধ হৃদয়ে পুনরায় উদ্দীপিত উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিল। তাহার ছিন্ন ভিন্ন মরম-বীণায় আজ আবার নূতন সুর বাজিল। স্থান কাল বিস্মৃত হইয়া সে আবেগ-কম্পিত গদ্‌গদ কণ্ঠে ডাকিল. "বেলা! তুমি এসেছ বেলা?"

বেলা নীরব নিস্পন্দ। বন্দী অরুণের সেই কদর্য্য হীন অবস্থা, নিষ্ঠুর বন্দিত্ব, যাহা কোনও দিন বেলা স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারে নাই, আজ সে তাহাই প্রত্যক্ষ দেখিতেছে, তাই অব্যক্ত অসহনীয় দুঃখে ক্ষোভে যেন তাহার কথা কহিবার শক্তিও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। বেলার সেই মৌনভাব অরুণকে অচিরেই তাহার তখনকার অবস্থার কথা স্মরণ করাইয়া দিল। অনুতপ্ত, লজ্জিত হইয়া সে ধীরে ধীরে বলিল, "আমার জন্যে তুমি আর অনর্থক কষ্ট করো না বেলা! ঘরে যাও পাপিষ্ঠকে তার মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত করতে দাও।"

বহুকষ্টে চিত্তাবেগ প্রশমিত করিয়া সে মৃদু করুণ সুরে বলিল, "কিন্তু তোমারি পাপ পুণ্যের ভাগী কবে' তোমার সুখদুঃখের সাথী করেই যে ভাগ্যনিয়ন্তা আমার ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করেছিলেন, তাঁর এ অলঙ্ঘ্য বিধান এড়িয়ে আমি আর কোথায় যাব?"

অরুণ বিস্ময়ে নির্বাক্ হইয়া গেল। এখনও এত প্রেম,—এত একাগ্রতা! বেলা মানবী না দেবী? এই দেবীকে সে অবহেলা অমর্য্যাদা করিয়াছে, তাই তো আজ এই শাস্তি!

হতভাগ্য অরুণের মর্ম্মস্থল কম্পিত মথিত করিয়া একটা গভীর দীর্ঘ-শ্বাস বাহির হইয়া গেল। সুগভীর বিষাদে আচ্ছন্ন হইয়া সে বলিল, "সে সব কথা তুমি এখন মন থেকে মুছে ফেলো বেলা!—আমাদের এ নিষ্ফল ভালবাসার স্মৃতিকে একটা ক্ষণিকের দেখা দুঃস্বপ্ন বলেই মনে

করো। পাষণ্ড ঘৃণিত জেলের কয়েদী তোমার মত দেবীর পবিত্র মহৎ প্রেমের কখনই উপযুক্ত নয়, তাকে ভুলে গিয়ে তুমি আবার—"..

"তুমি? তুমি আজ আমাকে এই কথা বলছ? ওগো! এ অভাগীকে এতদিন এত দুঃখ দিয়েও কি দুঃখ দেবার সাধ মেটেনি তোমার? আবার মড়ার ওপর খাঁড়ার আঘাত দিচ্ছ?"

হতভাগিনী বেলার যত্ন-নিরুদ্ধ অশ্রুরাশি এবার আর বাধা মানিল না, দরবিগলিত ধারায় বহিয়া সেই 'পরিম্লান কাতর মুখখানিকে এককালে প্লাবিত করিয়া দিল।

ব্যথাহত দীর্ণ বক্ষে অরুণ বলিল, "জানি, তুমি এ কথায় বড় ব্যথা পাবে, কিন্তু তোমার প্রতি আমারও তো একটা কর্ত্তব্য আছে বেলা! তোমার এত রূপ, এত গুণ, এই আশা আকাঙ্ক্ষায় ভরা তরুণ জীবন একটা পাপিষ্ঠ হীন বন্দীর দুর্ভাগ্যের সঙ্গে জড়িত করে' তুমি বৃথা কেন নষ্ট করবে? তাতে যে তা'র পাপের ভার অপরাধের বোঝা আরও ভারি করে' তোলা হবে বেলা!"

বেলা অশ্রু মুছিতে মুছিতে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "তুমি যে-ই হও, আর যাই করো, আমার চক্ষে তুমি এখনো নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক আর চিরদিন তাই থাকবে।

"আমি শুধু তোমার আশাতেই এই সাত বৎসর—"

"এতদিন? এতদিন তুমি আমার প্রতীক্ষা করবে বেলা?"

অরুণ নিরুদ্ধ নিশ্বাসে বেলার অশ্রুমলিন সুন্দর মুখের পানে অপলক মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

বেলা অবিচলিত স্থির স্বরে উত্তর করিল, "হ্যাঁ, কেবল এতদিন, এই সাত বৎসর কেন, যদি চিরদিন চিরজীবন, তোমার প্রতীক্ষায় থাকতে হয়, আমি তাই থাকব—আমি—"

বেলা কথাটা শেষ করিতে পারিল না। ওয়ার্ডার বাধা দিয়া বলিল, "আর দেরী করতে পারব না, সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।"

বন্দী অরুণের গায় তমসাচ্ছন্ন আঁধার জীবনে আশা ও আশ্বাসের সুবিমল জ্যোতি ফুটাইয়া, ক্ষত বিক্ষত দগ্ধ হৃদয়ের জ্বালা সান্ত্বনার মধুর স্নিগ্ধ প্রলেপে জুড়াইয়া দিয়া বেলা সেদিনকার মত বিদায় গ্রহণ করিল।

তেইশ

পূর্ব্ববর্ণিত ঘটনার কয়েকদিন পরে অরুণের নামে একখানি পত্র আসিল, বন্দীর পত্র না দেখিয়া দিবার নিয়ম নাই, তাই জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাহা খুলিয়া পাঠ করিলেন। পত্রখানি পাঠাইয়াছিল বেলা, সে লিখিয়াছিল—

—জীবনের সর্ব্বস্ব হৃদয়ের আরাধ্য দেবতা আমার! তুমি শুনে সুখী হবে, আমার জীবনে আর কোনও দুঃখ কোনও ক্ষোভই নেই।

যদিচ, তোমার শাস্তির অংশ গ্রহণ কববার, তোমার দুঃখ লাঞ্ছনা নিবারিত করবার শক্তি আমার নেই, তবু তোমার নির্ব্বাসনের বাহ্যিক কষ্টগুলি যতদূর সম্ভব আমি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে' আমার মনক্ষোভ, প্রাণের বেদনা প্রশমিত করবার চেষ্টা করছি—সে চেষ্টা আমার হয়তো সফল হয়েছে, কারণ আমার মন এখন অচঞ্চল শান্তিতে পরিপূর্ণ।

আমার শোবার ঘরখানা তুমি যদি দেখো, তাহলে বোধ হয় চিনতেই পারবে না। সে ঘরের আসবাব পত্র বিলাসের সাজ সরঞ্জাম সমস্তই একেবারে নিশ্চিহ্ন করে' ফেলেছি। শুধু তোমার ফোটোখানা যেখানে যেভাবে তুমি রেখেছিলে, ঠিক সেইভাবেই রাখা আছে।

এ ঘর এখন আমার আরাধনার মন্দির, আমার প্রাণের দেবতার পবিত্র চরণ-স্পর্শপূত পুণ্যতীর্থ, এখানে আমার জয়ন্তী বউদি ভিন্ন আর কারও প্রবেশাধিকার নেই।

জন্মজন্মান্তরের সুকৃতি বলেই আমি তাঁর মত দেবীকে সঙ্গিনীরূপে লাভ করেছিলুম।

তোমার ওখানকার আহার কি জানি না, জানবার চেষ্টাও কখনো

করিনি। উঃ! সে কথা মনে করতেও যে বুকখানা ফেটে যায়! রাজ-ভোগে যার দিন কেটেছে, সে কি না আজ—নাঃ! ওকথা আর তুলব না—তা'হলে আমার আর চিঠি লেখাই হবে না।

আমার আহার কি জানো? একবেলা হবিষ্যান্ন। তাতেই আমি আছি ভাল। শরীরে কোনও গ্লানি নেই, মনেও কিছু চাঞ্চল্য নেই। আমি বেশ শান্তিতে আছি।

ঘরের সে পালঙ্কখানা তুলে দিয়ে তোমার মত ঠিক তোমারই মত মাটীতে একখানা কম্বল পেতে রেখেছি, সেই-ই আমার এখন পূজোর আসন, শয়নের শয্যা সবই। গভীর নিঝুম রাতে, যখন সারা বিশ্ব জগৎ ঘুমের ঘোরে স্তব্ধ হয়ে যায়, তখন সেই ভূমিশয্যায় শুয়ে শুধু তোমারই ধ্যানে মগ্ন হয়ে আমি আকাশ পানে চেয়ে থাকি,—তখন আমার নিদ্রাহীন নিশীথ রাতের একমাত্র সাথী আকাশের অনির্ব্বাণ তারাগুলি, তা'দের সহানুভূতি ভরা জ্বল্‌জ্বলে হাজার হাজার চোখ মেলে—নির্নিমেষ হয়ে চেয়ে থাকে। মনে হয় এই স্বর্গের দেবদূতেরা এই নিস্তব্ধ রাতে তোমার দিকেও ঠিক এমনি করে চেয়ে চেয়ে, তাদের নীরব সান্ত্বনায় তোমাকে অভিষিক্ত করে দিচ্ছে,—তখনই তোমার আমার মাঝখানের এই দূরত্ব, সেই পাষাণ প্রাচীরের দুর্লঙ্ঘ্য অবরোধ লৌহ-কপাটগুলির বিরাট ব্যবধান যেন নিঃশেষে ঘুচে যায়।

মনে হয় তুমি আমার কাছে,—কত কাছে রয়েছ! আমার আঁধার প্রাণ আলো করে' তখন সেই দীপ্ত তারার মতই উজ্জ্বল হয়ে ফুটে ওঠে তোমার সেই পলকহারা, প্রেম-করুণায় ভরা স্নিগ্ধ মৌন আঁখি দুটী,—নির্জ্জন অন্ধকার ঘরের নিবিড় স্তব্ধতার মধ্যে তোমারই পবিত্র মধুর অঙ্গ-সৌরভ, তোমারই মৃদু কোমল নিশ্বাসের সুখস্পর্শটুকু অনুভব করে', পুলকে প্রেমে

আত্মহারা হয়ে আমি আমাদের এই মর্ম্মান্তিক দীর্ঘ বিরহের কথা একেবারেই ভুলে যাই।

ভুলে যাই তুমি আমার কাছে নেই, ভুলে যাই তুমি আমার কাছ থেকে অনেক তফাতে, অনেক দূর দূরান্তরে এখন রয়েছ।

এই বিস্মৃতি, এই ধ্যানের তন্ময়তাই এখন আমার জীবনের পরম ও চরম সুখ। এইভাবে, এমনি করে, সাতটী বৎসর কাটিয়ে দেওয়া কি বড়ই কঠিন কথা?

আমার ভাবনা, আমার ভয় হয় কেবল তোমার জন্য। অসহ্য দুঃখ কষ্টে ধৈর্য্যহারা হতজ্ঞান হ'য়ে পাছে তুমি কোনও অঘটন ঘটিয়ে ফেলো। —না, না, তা' করোনা, করোনা!

ওগো আমার জীবন-সর্ব্বস্ব! তোমার দুঃখ ক্লেশ যত কঠোর যতই অসহ্য হ'ক্, এখন তুমি বীরের মত সব সহ্য করো।

মনে রেখো, তোমার দুঃখিনী বেলা শুধু তোমার জন্যে, শুধু তা'র ভ্রষ্ট স্বর্গে স্থান পাবার আশাতেই এখনো এ প্রাণ ধারণ করে আছে। মনে রেখো, এ দুর্দ্দিন,—এ দুর্য্যোগ চিরস্থায়ী নয়। দুঃখের পর সুখ, মেঘের পর রৌদ্র, তিমির ঘন দুঃখ-রজনীর অবসানে সুখময় প্রভাত উদয়, করুণাময় বিশ্বনিয়ন্তার অপরূপ বিধানে এযে অবশ্যম্ভাবী।

তাই বলি প্রিয়তম! তুমি ধৈর্য্যভ্রষ্ট হ'য়ো না। তোমার অভাগী বেলাকে, তার তপস্যার ফল, সাধনার সিদ্ধিলাভে বঞ্চিত নিরাশ করো না তুমি; তোমার চরণে এখন আমার শুধু এই মিনতি।

—জেনো, তোমার বেলা চিরদিন তোমারি—একান্ত তোমারি থাকবে। জগতের কোনও বাধা, কোনও বিপত্তিই তাকে তোমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না—পারবে না।

আমি জীবনে মরণে তোমারি—"বেলা"।

সে লিপির প্রত্যেক ছত্রে নারীর প্রেমের দীপ্ত মহিমা যেন উজ্জ্বলতর হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছিল। প্রত্যেক শব্দে একখানি ব্যগ্র ব্যাকুল করুণার্ত্ত মধুর হৃদয়ের অপরিসীম বেদনা ও সহানুভূতি ঝরিয়া ক্ষরিয়া পড়িতেছিল।

সে পত্র পাঠ করিয়া জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কঠোর চিত্তও করুণায়, সমবেদনায় বিগলিত আর্দ্র হইয়া উঠিল।

এইরূপ পত্র, ইহাপেক্ষাও ব্যথাভরা সান্ত্বনাময় প্রেমলিপি বেলার নিকট হইতে প্রায় সদা সর্ব্বদাই আসিত। সে পত্রে পাষাণ বিগলিত হয়, মানবচিত্ত তো কোন ছার! প্রত্যেক সপ্তাহেই বেলা বন্দী অরুণের সহিত দেখা করিতে আসিত। সঙ্গে করিয়া আনিত আশা আশ্বাস আর আনন্দ।

সেই মহামহিমময়ী দেবী প্রতিমার কোমল চরণস্পর্শে সে নিরানন্দ অভিশপ্ত কারাগার যেন মুহূর্ত্তের জন্য আনন্দময় স্বর্গলোকে পরিণত হইত।

হতভাগ্য বন্দীর সকল ব্যথা, সকল গ্লানি সে যেন নিমেষে মুছাইয়া দিয়া তাহার দুর্ব্বল ক্ষীয়মাণ শক্তিকে পুনরুদ্দীপিত করিয়া দিয়া যাইত।

এই পত্র, এই সঙ্গটুকু, যুবক অরুণের অসংযত উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তবৃত্তিকে যেন কোন্ ঐন্দ্রজালিক প্রভাবে অচিরেই সংযত দৃঢ় ও সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া দিল। সেই নারী-রত্নের একাগ্র সাধনায়, প্রাণপাত যত্নে অরুণের কলঙ্কমলিন ভ্রষ্ট চরিত্র ক্রমশঃ অগ্নিশুদ্ধ স্বর্ণের মতই পবিত্র নির্ম্মল হইয়া উঠিল।

বন্দীর সততা ও শিষ্ট, ভদ্র আচরণে তাহার মেয়াদ-কাল দুই বৎসর কম করিয়া দেওয়া হইল।

পাঁচ বৎসর, সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসর পরে মুক্তিলাভ করিয়া, দীর্ঘ দিনের লাঞ্ছনা অবমাননা ও কলঙ্কের বোঝা বহন করিয়া অরুণ যখন সঙ্কোচ-জড়িত পদক্ষেপে, কারাগারের বাহিরে অবনত শিরে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন সেখানে তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য একখানা ভাড়াটিয়া গাড়ী অপেক্ষা করিতেছিল, সেই গাড়ীতে ছিল বেলা।

বীরের সহধর্ম্মিণী যেমন তাহার বিজয়ী পতিকে শ্রদ্ধায় সম্ভ্রমে গৌরবে বরণ করিয়া লয়, বেলা তাহার চেয়েও আদরে, তাহার চেয়েও আনন্দে আগ্রহে তাহার ভাগ্য-নিগৃহীত, লাঞ্ছিত দয়িতকে, তাহার কঠোর তপস্যালব্ধ হারানিধিটিকে; দ্বিধাহীন অসঙ্কোচে নিজের পাশে তুলিয়া লইল।

শেষ

জয়ন্তীর যত্নে ও আগ্রহে বেলা ও অরুণের শুভ পরিণয় কলিকাতাতেই সম্পন্ন হইল বটে, কিন্তু তাহারা অতঃপর আর সেখানে বসবাস করা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিল না।

তাই বেলা তাহার পৈত্রিক বাটীখানি বিক্রয় করিয়া ফেলিয়া স্বদেশের সহিত সকল সম্পর্ক ঘুচাইয়া, স্বামীর সহিত এক অপরিচিত দূর বিদেশে চলিয়া গেল।

মাস দুই পরে জয়ন্তী সেখান হইতে বেলার একখানি পত্র পাইল। সে তাহার সখী, গুরু, হিতৈষিণী জয়ন্তীকে শতকোটি প্রণাম ও প্রাণের গভীর কৃতজ্ঞতা সানন্দে নিবেদন করিয়া লিখিয়াছে—

"বউদি ভাই!

তোমার ভবিষ্যদ্বাণী এবার সত্যই সফল হয়েছে। আমার জন্ম-জন্মান্তরের সুকৃতি-বলে, আর তোমার আশীর্ব্বাদে—পাথর আজ যথার্থই পরশমণি হয়েছে। বাস্তবিক কাছে থাকলে দেখতে,—তিনি এখন নূতন মানুষ; তাঁর মহত্ত্ব, তাঁর দেবত্ব এখন এদেশে সর্ব্বসাধারণের আদর্শস্থল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তোমার দুঃখিনী বেলার জীবনে আজ আর কোনও দুঃখ, কোনও অভাব নেই বউদি! অযাচিত আদরে, সোহাগে, অপরিমিত সুখে সম্পদে ভরিয়ে দিয়ে তিনি এ কাঙালিনীকে রাজরাজেন্দ্রাণীর আসনে তুলে বসিয়েছেন!

আমার জীবনের সুখ-স্বপ্ন, যৌবনের কঠোর তপস্যা এতদিনে সফল সার্থক হয়েছে বউদি! আমার সুখ আশাতীত, বর্ণনাতীত! কিন্তু আমার

এ সুখ সৌভাগ্যের মূলাধার তুমি, তুমি না থাকলে, তুমি দয়া না করলে—বোধ হয় এতদিন বেলার অস্তিত্বও এ জগতে থাকত না।

তাই আজ এ সুখের দিনে একটীবার ছুটে গিয়ে তোমার গলা জড়িয়ে, যেমন সেই দুঃখের দিনে একটুখানি সান্ত্বনা পাবার জন্যে দুঃখের কান্না কাঁদতুম, তেমনি করেই একবার প্রাণ ভরে' সুখের কান্না কাঁদতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু তুমি যে আজ অনেক দূরে!

তাই আজ চিঠিতেই আমার সব পাওয়া প্রাণের অসম্বরণীয় আনন্দের উচ্ছ্বাস,—অন্তরের উচ্ছ্বসিত ভক্তি কৃতজ্ঞতা তোমাকে নিবেদন করছি।

সব চেয়ে আনন্দের, সব চেয়ে সুখের কথা এই যে, আমি আমার দেবতাকে তাঁর ভ্রষ্ট সিংহাসনে আবার দেবতার মতই পূর্ণ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছি। আমার নারী-জন্ম আজ ধন্য সার্থক হয়ে গেছে।

আবার বলি, বউদিমণি আমার! আমার অশুভ জীবনের তুমিই মঙ্গলময় শুভ গ্রহ, তুমি আমার কল্যাণময়ী ইষ্টদেবী—তোমার প্রসাদেই আমি আমার ব্যর্থজীবনে সার্থকতা লাভ করেছি,—আমার নষ্ট স্বর্গ আবার ফিরে পেয়েছি।"

অরুণ তাহার সাধ্বী সহধর্ম্মিণী বেলার সাহায্যে শুধু চরিত্রগত পরিবর্ত্তনই নহে, তাহার কর্ম্মজীবনেও বিলক্ষণ উন্নতি করিতে সমর্থ হইয়াছিল। সে দেশে তাহার এখন মস্ত কারবার, বিপুল খ্যাতি প্রতিপত্তি। এক কথায় অরুণ এখন দশের একজন।

কালক্রমে চৌধুরী মহাশয়ও অপরাধী পুত্রকে ক্ষমা করিয়াছিলেন এবং বেলাকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কারণ অবিনাশবাবু

তাঁহার স্নেহের পাত্রী বেলার মঙ্গলার্থে মিঃ বোসের সহায়তায় তাহার মাতৃগত অপবাদ মোচন করিতে পারিয়াছিলেন। বিস্তর চেষ্টা চরিত্র করিয়া তিনি বেলার জননীর যে অভিভাবক কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন, সেই ব্যক্তিকে এবং তাঁহাদের বিবাহ-সভায় আহূত কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোককে কাশী হইতে কলিকাতায় আনাইয়া মহেশবাবুর বিবাহ যে যথার্থই ধর্ম্ম ও শাস্ত্রসঙ্গত হইয়াছিল, তাহা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত করিয়াছিলেন।

পিতার বিলুপ্ত স্নেহ ও ক্ষমা লাভ করিয়া অরুণের জীবনে যেটুকু অভাব ছিল, তাহাও পূর্ণ হইয়া গেল। কিন্তু তাহার সকল সুখ সৌভাগ্যের মূলে ছিল, একটী মহীয়সী নারীর একাগ্রচিত্তের একনিষ্ঠ, পবিত্র পুণ্য 'প্রেমের পরশ'।